ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-V, May, 2026, Page No. 2094-2101
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.05W.470

হরিভূষণ পালের ছোটগল্প: এক বিক্ষুব্ধ সময়ের দর্পণ

দীপক দে, *অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রামঠাকুর কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 25.05.2026; Accepted: 27.05.2026; Available online: 31.05.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The short stories of Haribhushan Pal serve as a powerful mirror of the turbulent socio-political history of Tripura in the twentieth century. Born in 1946, Haribhushan Pal witnessed crucial historical events such as Partition, refugee influx, ethnic conflicts, insurgency, political unrest, and the communal riots of 1980, all of which deeply influenced his literary consciousness. His stories portray the struggles, anxieties, and emotional trauma of ordinary people caught in the crisis of time and history. Through realistic narration and humanistic insight, Pal depicts the changing relationship between Bengali refugees and indigenous tribal communities, the erosion of communal harmony, and the devastating effects of violence and separatism. Stories like 'Nanda Telir Shishi Botol', '', and 'Nihoter Shankhya Sat' reveal the painful realities of displacement, border politics, communal hatred, terrorism, and moral degeneration within society. Pal's fiction not only documents historical experiences but also raises questions about humanity, coexistence, and social responsibility. His portrayal of uprooted refugees, victimized women, and marginalized tribal communities reflects deep compassion and social awareness. At the same time, his narratives expose the selfishness, indifference, and hypocrisy of modern civilized society. Haribhushan Pal transforms the regional experiences of Tripura into universal human concerns. His stories become living documents of a disturbed era, combining social realism with artistic sensitivity. Thus, his short fiction occupies a significant place in the tradition of Bengali literature of Tripura as a literary testimony of conflict, suffering, resistance, and the enduring aspiration for peace and harmony.

Keywords: Haribhushan Pal, Tripura, Bengali Short Stories, Partition and Refugees, Communal Conflict, Insurgency and Violence, Social Realism

(১)

জীবনের অতল সম্ভাবনাগুলোকে নিয়েই গহনচারী শিল্পীমনের প্রাত্যহিক সাধনা। তাইতো একজন সাহিত্যিকের পক্ষে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা, বিশেষ দৃষ্টিকোণ বা বিশেষ উপলব্ধি জীবন বিশ্লেষণের চাবিকাঠি। গোটা সাহিত্যবিশ্বের সঙ্গে উত্তরপূর্ব ভারতের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরাতেও বাংলা সাহিত্যচর্চা, বিশেষত ছোটগল্পচর্চা এই নিয়মেই আপন গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

অরণ্যকুন্তলা ত্রিপুরার বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে হরিভূষণ পাল (১৯৪৬-২০১৪) একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। হরিভূষণ পাল যে সময়টাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সময়টা ছিল ঘটনাবহুল। সময়টা বিশ শতকের চল্লিশের দশক। তখন ত্রিপুরার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে ঘটে গেছে অনেক উত্থান-পতন। গোটা ভারতবর্ষের পরিবেশ তখন উত্তপ্ত। সবেমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত শিখরে। আর ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু স্রোত, জনশিক্ষা আন্দোলন, মার্কসবাদী আন্দোলন– এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার অভিঘাত ত্রিপুরার সমাজকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, পরবর্তীতে দেশভাগের ফলে সূত্রপাত ত্রিপুরার আদিবাসী বাঙালির সংঘাত, ৮০ এর জুনের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, উগ্রপন্থী সমস্যা, রাজনৈতিক উত্তেজনা, সমতল ও পাহাড়ের দ্বিমেরু বিষম দূরত্ব প্রভৃতির স্পষ্ট ছবি হরিভূষণ পালের গল্পের পাতায় বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবিক পটে উঠে এসেছে।

সাহিত্য সমাজের দর্পণস্বরূপ। আর শিল্পী-সাহিত্যিক মাত্রেই সমাজের প্রতিনিধি। সমাজমানসের ভাব-বেদনা তাঁদেরই রচনায় বাণীবিগ্রহ লাভ করে। সাহিত্যিক হরিভূষণ পালের জীবন পটভূমিকায় ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা- সমকালের সমাজের বুকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করেছে। এমন এক ক্ষত সমাজের শরীরে তৈরি হয়েছে যা এখনও নির্মূল হয়নি। যার রক্তিম দগদগে চিহ্ন আজও বিদ্যমান। আর সমাজের বুকে যখন আঘাত আসে, সংঘর্ষের আকার যখন চরমে উঠে, তখন জীবনও সমানভাবে বিপন্নবোধ করে। জীবনের অস্তিত্ব সংকট তার মানবিক ভিত্তিতে কম্পন ধরায়, এক গভীর জটিল ভাঙচুর শুরু হয়ে যায়। তখনকার সাহিত্য সেই জীবনকে অস্বীকার করতে পারে না, পারে না এর থেকে পিছন ফিরে থাকতে।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিপুরার বাংলা কথাসাহিত্য ধারা সমাজ বিবর্তনের সূত্রে বিপুল কলেবর পায়। সমকালের সমাজ ও জীবন সাহিত্যে পূর্ণ বাস্তবতায় উঠে আসে। হরিভূষণ পাল বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক সময়কাল জুড়ে গভীর ভাবে ছোটগল্প চর্চা করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সমগ্র জীবনজুড়া বিচ্ছুরিত সামাজিক পটকে তাঁর কথাসাহিত্যের পাতায় নতুন আঙ্গিকে, নতুন অবয়বে এবং নতুন ভাষাবিন্যাসে তুলে ধরেছেন। হরিভূষণ পালের ছোটগল্পের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিসরে সময় ও সমাজের নানা সমস্যার চিত্র উঠে এসেছে। দেশভাগের ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে যেসব মানুষ ত্রিপুরায় এসেছেন, অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপন্ন হয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যারা নতুন ভাবে বাঁচার চেষ্টা করেছেন, তাদের কথা তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা আদিবাসী উপজাতি গোষ্ঠীর জীবনচর্চা ও তাদের জীবন সংগ্রাম, তাদের সঙ্গে বাঙালি জাতির শান্তি ও সম্প্রীতির বন্ধন ও তার ভাঙন কথাকারের গল্পকথায় উঠে এসেছে। তাছাড়া উগ্রবাদী সমস্যা (বৈরী আক্রমণ), আশি শনের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক জটিলতা এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার প্রচেষ্টায় শুভ চিন্তকদের এগিয়ে আসা ও তাদের পরিণাম হরিভূষণ পালের গল্পের মৌল আকল্প । ফলে তাঁর গল্পে ধরা পড়ছে অতীত-সমকাল- ভবিতব্য। তাঁর গল্পের ভুবন হয়ে উঠেছে সমকালের দর্পণ।

(২)

কথাসাহিত্যিকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির মধ্যে একটি হল 'নন্দ তেলীর শিশি বোতল'। দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল বাঙালি ও পার্বত্য ত্রিপুরার অন্তপরিসরে অবস্থিত উপজাতিদের সরলরৈখিক জীবন, তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ও শান্তি-সম্প্রীতির বন্ধন লেখক আন্তরিক বর্ণনায় চিত্রাঙ্কন করেছেন।

গল্পের মূল পটভূমি ত্রিপুরার তোতাবাড়ী গ্রাম। সে গ্রামের একজন বাসিন্দা সত্তর বছর বয়সী নন্দকুমার দাস। গ্রামের হাটের মুখে তার তেলের দোকান। হাটে সে পঞ্চাশ দরে 'কেরাচি আর ভাল তেল' বিক্রি করে, যার জন্ম তার নাম পড়ে যায় নন্দতেলী। আশে পাশের গ্রামের সবাই তার খদ্দের। কোন বাড়ির কোন বোতল সে অন্ধকারেও বলে দিতে পারে। এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর অভিজ্ঞতা এতই বেশী যে তেলের শিশি-বোতল দেখেই

সে সেই পরিবারের আর্থিক অবস্থা বলে দিতে পারে। তোতাবাড়ী গ্রামে এতদিন জাতি উপজাতির মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি ছিল। দেশভাগের আগে এবং পরেও তা বজায় ছিল, ছিল সহৃদয়তা।

গল্পকার সুকৌশলে ত্রিপুরার পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একসময় ৮০ জুনের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার প্রভাব তোতাবাড়ী গ্রামেও পড়ে। তোতাবাড়ী গ্রামে ক্রমে অসাম্প্রদায়িকতায় অধ্যুষিত হয়। জাতি-উপজাতিদের মধ্যে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের হাওয়া বইতে শুরু করে। তোতাবাড়ী গ্রামে নতুন মানুষের আনাগোনা দেখতে পায় নন্দবাবু। গল্পকার এদের বলেছেন 'আলগা মানুষ'। এই 'আলগা মানুষ'রা আসলে উগ্রপন্থী দলের সদস্য। উগ্রপন্থীর আগমনে গ্রামের চেহেরা বদলে গেছে। গল্পকার লিখেছেন—

> "বুকটা ভারী হয়ে যায় নন্দ তেলীর। সবাই এখন কেমন যেন চাপাচাপা। প্রাণ খুলে কেউ কারো সাথে কথাও বলতে চায় না।"[১]

গল্পকার সামান্য তেলের বোতলের ইঙ্গিতে সমাজ পরিবর্তন দেখিয়েছেন— তিনি এমনই সুদক্ষ কথাকার। এখন বেলাবেলিতে হাট বন্ধ হয়ে যায়। তেলের শিশিও বদলাতে থাকে। এখন প্রাচীন তেলের শিশিগুলোর বদলে নন্দতেলীর দোকানে আসে প্লাস্টিকের শিশি, সুন্দর কাচের বোতল। বোতলের পরিবর্তন দেখে নন্দতেলী বুঝতে পারে গল্পের অন্যতম চরিত্র বিন্দুরাম রিয়াং এর বাড়িতে আজকাল যে অজানা মানুষ আসে তারা এসে গেছে বা আসবে, অর্থাৎ তোতাবাড়ী গ্রামে উগ্রপন্থীর আক্রমণ নিশ্চিত। এরপর নন্দতেলী সন্ধ্যার অন্ধকারে সামান্য দূরেই বিন্দু বিয়াং-এর জংলি পোশাক পরিহিত ছেলেকে দেখতে পায়। তার চোখ দুটো চিতাবাঘের মতো জ্বলছে। তারপর নন্দতেলী হঠাৎ একদিন পত্রিকার খবর হয়ে যায়—

> "নন্দ তেলীর এর পরের অধ্যায়টা পত্রিকাতেই ছাপা হয়। মোটা কালো হরফে হেড্ লাইন দিয়ে লিখেছিল, 'সন্ধ্যাররাতে তোতাবাড়ী বাজারে বৈরী হানা, নিহত এক'। নিজস্ব সংবাদদাতার বিবরণ দিয়ে আরও লেখা হয়েছিল 'নিহত ব্যক্তি একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নাম নন্দকুমার দাস। বয়স সত্তর। অনুমান করা যাচ্ছে নন্দকুমার বাজার থেকে বাড়ী ফেরার পথেই বৈরীদের কবলে পড়ে। ঘটনাস্থলেই তার গুলীতে ঝাঁঝরা মৃতদেহটি পড়ে ছিল। নন্দকুমার দাস এলাকাতে নন্দতেলী নামেই সবার কাছে পরিচিত ছিলেন। সদালাপী নন্দ তেলীর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে"[২]

নন্দ তেলীর রক্তে লেখা হল হিংসা আর অবিশ্বাসের কথকথা। সন্ত্রাসবাদ যে মতাদর্শের ধার ধারে না, তা স্পষ্ট হয়েছে নন্দর মৃত্যুতে, কেননা তার মতো নিরীহ মানুষ কারো শত্রু হতে পারে না। ১৯৮০ এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ত্রিপুরার সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করেছিল। লেখক হরিভূষণ পাল তারই করুণ কাহিনি অকৃত্রিম দরদের সাথে নন্দ তেলীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন।

(৩)

'ছিন্নমূল' গল্পে দেশভাগের দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছেন কথাকার হরিভূষণ পাল। দেশভাগের ফলে শিকড় ছেঁড়া মানুষগুলির অন্তরভেদী যন্ত্রণা, স্বপ্ন, অতীত চারিতা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে এখানে শুধু যন্ত্রণা আর স্মৃতি বিহ্বলতা নয়; দেশভাগের কারন, দেশভাগের ফলে অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন ছিন্নমূল বাঙালির এরাজ্য-ওরাজ্য আসা ও তাদের জীবন সংগ্রাম, দেশভাগের পিছনকার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, সীমান্তকেন্দ্রীক সমস্যা, প্রশাসনিক জোচ্চুরিপনা, হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিশ্বাস - অবিশ্বাস ও সম্প্রীতি বিদ্বেশ চেতনা, গণমাধ্যমের অপপ্রচার এবং দেশভাগের অন্তঃপুরের অকথ্য বিবর্ণ কাহিনি হিসেবে নারীদের উপর দাঙ্গাকারীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের চিত্র লেখক গল্পে বাস্তবায়ন করেন।

ধর্মের নামে দেশ দুভাগ হয়ে গেল, যে দেশে এত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়—

> "নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান
> বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান"[৩]

সেই বৈচিত্র্যের মাঝখানেই ক্ষমতা লোভী, স্বার্থান্বেষী একশ্রেনির রাজনৈতিক নেতারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থের নেশায় চির ধরাল। গল্পের শুরুতেই এপার বাংলায় অবস্থিত হেমন্তপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বিনোদ দত্তের 'ভারতী টি স্টলের' চায়ের আড্ডায় সীমান্তকেন্দ্রিক জটিলতার চিত্র উঠে এসেছে। গ্রামবাসীদের কথোপকথনে প্রকাশ পেয়েছে দেশভাগের পিছনে ব্রিটিশ সরকারে হস্তক্ষেপ এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা। সীমান্তবর্তী এলাকায় জলপাই রং-এর পোশাক পরিহিত হিন্দিভাষী সেপাইদের দেখে গ্রামবাসীর মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধে। চারিদিকে এই নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়। বিনোদ দত্ত এই সন্দেহের নিরসনে বিস্তারিত খবর জানাল—

> "রাজা নাকি চুক্তি করতে চেয়েছিল। কিন্তু ব্রিটিশরা রাজী হয় নি। আর হবেই বা কেন? এলাকাটির পাশেই ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে ব্রিটিশের নিজের রাজত্ব। সেখানে বসে মাটির নীচে নল সেঁধিয়েই তো টেনে নিতে পারে রাজার এলাকার সব তেল আর গ্যাস। রাজার সাথে চুক্তি করে লাভের কড়িতে ভাগীদার বসাতে কে আর চায়। জাতটার নাম যে ব্রিটিশ!"[৪]

গল্পে বৃহত্তর ভারতবর্ষের রাজনীতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। আবার তাদের কথায় উঠে আসে 'সাপ্তাহিক সমাচার দর্পণ', 'আকাশ বাণী', 'বিবিসি'র মত যুগান্তকারী পত্রিকার প্রসঙ্গ, গান্ধীজির কথা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথা। স্বদেশী আন্দোলনে তাদের ভূমিকা কতটা তা প্রত্যেক ভারতবাসীর জ্ঞাত। গল্পের অন্যতম প্রধান চরিত্র 'সহজ হোমিও চিকিৎসক' নকুলের বয়ানে সত্য হয়ে উঠে স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস। নকুল বলে— "ঐ যে গান্ধী মহারাজ! একদিকে ভারত ছাড়োর ঠেলা, অন্যদিকে চট্টগ্রামে স্বদেশী ডাকাতদের অস্ত্রলুঠের ঘটনা। তাতেই তো ব্রিটিশেরা দইম্যা গেল। নইলে..."[৫] 'নইলে'- এই জিজ্ঞাসা ব্যঞ্জক শব্দেই নিহিত রয়েছে ইতিহাস। সেই ইতিহাসে ত্রিপুরা কীভাবে জড়িয়ে আছে তা লেখকের বয়ানে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু সেই অধ্যায়েও রয়েছে একটি অন্ধকারময় ইতিহাস। বহু বাঙালি হিন্দু পরিবার মুক্তিযুদ্ধের আগুনে জ্বলেছিল। সর্বত্র যেন হিন্দু নিধন যাত্রা শুরু হয়েছিল। পাক্ সেনার হুমকির রাতেই নকুলের মেজ জ্যাঠা তার স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়েকে নিয়ে ভারতে চলে আসেন। নকুলের বাবা কেবল সকলের ছিন্নমূল হওয়ার দৃশ্য দেখল। পাক্ সেনাদের কঠোর নির্যাতনে তার চোখের জলও শুকিয়ে গেছে। কিন্তু ভোরের দিকে নকুল যখন বাবার বুকে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল— "বাবা, সব্বাই তো চইল্লা যায়, আমরা কুন্ হানে যামু?"[৬]

যখনই পৃথিবীতে কোনও সন্ত্রাস দেখা দিয়েছে, তখনই সেই সন্ত্রাসের করাল গ্রাসের প্রথম শিকার হয়েছে একজন নারী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সর্বপ্রথম পুরুষ দন্ডের আঘাত আছড়ে পড়েছে একজন নারীর ওপর। এই গল্পে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের বলি হয়েছে মালতী। এরপর থেকে মালতী নিজের মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে শামুকের মতো। তার বাঁচার ইচ্ছেটুকু নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তার ছেলের দিকে তাঁকিয়ে সে বেঁচে আছে। মালতী শারীরিক নিগৃহীত হয়। তা-ই আমাদের কাছে স্পষ্ট করে তোলে রামায়ণ, মহাভারতের কাল থেকেই প্রকাশ্যে মেয়েদের নগ্ন করার মধ্যে দিয়ে পৌরুষের যে মিথ্যা অহমিকা তৃপ্ত হয় তা আজও অব্যাহত।

পঞ্চায়েত প্রধানের মুখে নকুল জানতে পারল তেল গ্যাস বা গরু-মোষ কিছুই নয়, এখানে কাঁটাতারের বেড়া হবে। এদিকে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের জন্য কাঁটা কম্পাস দিয়ে মেপে মাটিতে ধারাবাহিকভাবে কাঠের

খুঁটি গর্ত করে বসিয়ে কোদাল দিয়ে খুঁটির চারপাশে ছোট করে বৃত্ত একে দেওয়া হল। আর নকুলের জমির সবটুকুই পড়েছে কাঁটাতারের ওদিকে বাংলাদেশের সীমানায়। তখন নকুলের অবস্থা—

> "বজ্রহাতের মত দাঁড়িয়ে থাকে নকুল।... মাথাটা যেন ঘুরতে থাকে তার। আগুন ঝরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকে খুঁটিটার দিকে। তার মনে হল মাটি ভেদ করে এক বিষাক্ত সাপ ফনা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। চারদিকে আঁকা বৃত্তটাকে মনে হচ্ছে বিষাক্ত সে সাপের কুন্ডলী। উদভ্রান্ত নকুল চেয়েই থাকে খুঁটি আর বৃত্তের দিকে। তারপরই হঠাৎ যেন ক্ষেপে যায় নকুল। উন্মাদের মত ক্রমাগত লাথি মারতে থাকে বিঘৎখানেক উঁচু সে খুঁটিতে। খুঁটি একটুও নড়ে না। ওদিকে পায়ের ব্যথায় দাঁড়াতে পারছে না নকুল। তীব্র, আক্রোশে এবার থুথু ছিটাতে থাকে খুঁটির গায়ে। কিন্তু তাও সে পারল না। তীব্র উত্তেজনায় তার গলা শুকিয়ে কাঠ। দু'ফোঁটা থুথুও বের করতে পারল না মুখ দিয়ে। তবু দমল না নকুল। এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে থাকে খুঁটির মাথায়। চোখে মুখে ভেসে ওঠে হিংস্র হাসির রেখা। খুঁটির চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রস্রাব করতে থাকে আর বিড়বিড়ানির চেষ্টায় একটু করে কেঁপে ওঠে তার ঠোঁট জোড়া।"[৭]

গল্পে নকুলের এই প্রতিবাদ কেবল নকুল বা গল্পকারের নয়, তা ছিন্নমূল মানুষের, মনুষ্যত্ব বহনকারী সকল সংবেদনশীল মানুষের প্রতিবাদ। এরপরের দৃশ্যে দেখি মালতীর চোখের দৃষ্টি স্থির, দূরে কোথায় যেন নিস্তব্ধ। এই যন্ত্রণা মালতী ও নকুলদের মৃত্যুর গহনচারী করে তোলে। সেই নিবদ্ধ দৃষ্টি কেবল মৃত্যুকেই খোঁজে। তারপরেই নকুলের ছোট্ট ছেলেটি তার হাত ধরে জানতে চায়— "বাবা, এইবার আমরা কই যামু?"[৮]

এই প্রশ্ন উদ্বাস্তুদের বাঁচা মরার প্রশ্ন। দেশভাগ বহু মানুষকে তাদের বাঁচা মরার পথে ঠেলে দিয়েছে। দেশভাগ মানে শুধু কাঁটাতারের বেড়া নয়, কাঁটার দাগ এখনও মানুষের মননে-চিন্তনে-জীবনযাপনে রয়ে গেছে; তাই দেশভাগ মানে শুধু দাঙ্গা নয়, ঘর হারানো নয়, ছিন্নমূল হওয়া নয়, তাতে মিশে আছে এক বিরাট সামাজিক–সাংস্কৃতিক–রাজনৈতিক বোল বদলের ছবি, যা উদ্বাস্তু এবং এপারের মানুষদের মধ্যেও কখন যেন আগোচরে এসে সব বদলে দিয়ে চলে গেছে। দেশভাগের কল্লোলিত রক্ত নদীর স্রোতে বাহিত হল কতশত নিষ্পাপ জীবন, কে রাখে তার খোঁজ, কে নেয় তার খবর। কিন্তু গল্পকার হরিভূষণ পাল তাঁর মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্বাস্তু জীবনের জীবন্ত দলিল নির্মাণ করেছেন 'ছিন্নমূল' গল্পে।

(৪)

সাহিত্য স্রষ্টা হরিভূষণ পালের 'নিহতের সংখ্যা সাত' ত্রিপুরার এক উত্তাল সময়ের পেক্ষাপটে রচিত। কিন্তু এই গল্পের প্রাসঙ্গিকতা আজকের যুগেও রয়েছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ ও ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পরবর্তী পর্বে ত্রিপুরার জনজীবনে তীব্র জোয়ার ভাঁটার ধাক্কা লাগল। বঙ্গভাষী উদ্বাস্তুরা ব্যাপকভাবে ত্রিপুরার সমভূমি, পাহাড়ে-বন্দরে খুঁজতে লাগল নতুন ঠিকানা। সেই সময় একশ্রেণির বিচ্ছিন্নতাবাদী কায়েমি গোষ্ঠীর প্ররোচনায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস বিদ্বেষ তীব্র আকার ধারন করে। এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলস্বরূপ ত্রিপুরার পাহাড়ি উপজাতিদেরই এক শ্রেণির মানুষ বাঙালি জাতির উপর হাটে-ঘাটে-বাটে-জঙ্গলে আক্রমণ চালিয়েছে।

ত্রিপুরার সেই উত্তাল মুহূর্তেও এক শ্রেণির বাঙালি পুরুষরা নিজেদের মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে আরাম-আয়েসকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করেছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের শিকার হয়ে কত মানুষ প্রাণ হারাল এবং দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি কেমন তাতে তারা কর্ণপাত করেননা। বিষয়-আসয়, অফিস-কাজকর্ম, সুখ-ভোগেই তারা বেছে নিয়েছেন জীবন যাপনের পথ হিসেবে।

গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুবর্ন এরকমই একটি চরিত্র। সুবর্নের আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে গল্পকার সমাজের তথাকথিত ভদ্রবিলাসী, শিক্ষিত, আধুনিক তকমাধারী, মুক ও বধিরতার মুখোশধারী শ্রেণির মানুষের গালে সপাটে চড় বসিয়েছে।

রেডিওতে বৈরী আক্রমণের খবর শুনে সুবর্ণ যে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে তাতে তার মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং মনুষ্যত্বহীনতার চরম পরিনতি লক্ষিত হয়। পাশাপাশি বৈরী আক্রামণকে কেন্দ্র করে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের স্বার্থসিদ্ধিমূলক প্রচার কর্মের দিকটিও সুবর্ণর বয়ানে স্পষ্ট হয়।

গল্পের পরবর্তী অংশে দেখি বিমলবাবুর অবুঝ নাতিটা সুবর্ণের কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখে হেসে কুটি কুটি। এই হাসি আসলে তথাকথিত সভ্য সমাজের ভন্ড, মুখোশধারী মানুষের প্রতি। এই হাসি লেখকের প্রতিবাদের বাণী। এই হাসিতে সুবর্ণের চেতনা জাগ্রত হয়। সে নিজেকে ধিক্কার জানায়। সুবর্ণর মানবিক সত্তা বলে ওঠে—

> "ভাবুনতো একবার, এতগুলি তরতাজা প্রাণ। কত মায়ের বুক খালি হয়ে গেল, কত সংসার শেষ হয়ে গেল। অথচ কারো যেন কোনো মাথা ব্যথা নেই। বার ঘন্টা কি চব্বিশ ঘন্টা স্ট্রাইক ডেকে দিলেই শেষ। মানুষ যেন এখন পশুর চেয়েও অধম হয়ে গেছে।... তাই এমন সব ঘটনা ঘটতে পারছে নিত্যদিন। সবাই সহ্য করে চলেছে মুখ বুজে।"[৯]

গল্পের শেষে হকার সুবর্ণর বাড়িতে পত্রিকা দিয়ে গেল। প্রথম পাতাতেই কালো মোটা হেডলাইনে বৈরী হানার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। সুবর্ণ খবরটা না পড়েই আয়নায় নিজের চেহারার মধ্যে কী যেন খুঁজতে চেষ্টা করল। তারপর—

> "হতাশ হয়ে কলম নিয়ে পত্রিকার যেখানে ছাপা ছিল নিহতের সংখ্যা হয়, সেখানে 'ছয়' কেটে লিখতে থাকে 'সাত'। বারবার হাত ঘুরিয়ে 'সাত' সংখ্যাটি স্পষ্ট করে তুলতে থাকে সুবর্ণ।"[১০]

'সাত' নম্বর নিহত ব্যক্তিটি কে? সে কি সুবর্ণ? নাকি আমি, আপনি, আমরা সবাই। নাকি এই সমাজ। যে সমাজে আজ মানবিক মূল্যবোধ মৃতপ্রায়। এই দায় আমাদের সকলের। লেখক ত্রিপুরার এক বিশেষ সময়ের লেখনিতে শক্তিমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে গল্পের কথনভাষ্যে সমাজের রূঢ় বাস্তবতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বাণী উচ্চারণ করেছেন।

কথা সাহিত্যিক হরিভূষণ পালের গল্প সাহিত্যে ঘুরে ফিরে বার বারই এসেছে ত্রিপুরার একসময়ের জ্বলজ্যান্ত সমস্যা উগ্রপন্থী হামলার বিভৎস চিত্র। তাঁর 'আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা ত্রিপুরা বনধ' গল্প সংকলনের অন্তগর্ত 'আগামীকাল চব্বিশ ঘন্টা ত্রিপুরা বনধ' গল্পেও লেখক উগ্রপন্থী আক্রমণকে কেন্দ্র করে মানুষের স্বার্থপরতা, বিলাস বহুলতা, দেশ-কাল পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীনতা নতুন আঙ্গিকে, নতুন অবয়বে রূপায়িত করেছেন। গল্পে উগ্রপন্থীর আক্রমণে একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে বীভৎসতা ও করুণ পরিনতি আমাদের হৃদয়ার্দ্র করে তোলে। লেখক হরিভূষণ পাল এই গল্পে প্রতিবাদের বাণী যেমন উচ্চারণ করেছেন, তেমনি সমাজকে সচেতন হওয়ার এবং আত্মবিশ্লেষণী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। পাশাপাশি গল্পটির নামকরণ সাধারণ হয়েও লেখকের লেখনীগুণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার ভ্রান্ত পথ যেভাবে এরাজ্যের দীর্ঘ দিনের সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করেছিল তারই ইতিহাস রচনায় কথাকার হরিভূষণ পাল 'জলপাই রং- এর পোষাক' নামে আরেকটি গল্প রচনা করেছেন। গল্পটিতে যেন লেখক নতুন আঙ্গিকে, নতুন পরিনতিতে 'নন্দ তেলীর শিশি বোতল' গল্পের পরবর্তী অধ্যায় রচনা করেছেন। গল্পের পটভূমিকায় রয়েছে পাহাড়ি-বাঙালি মিলিয়ে ত্রিশ পয়ত্রিশটি পরিবারে তোতাবাড়ী গ্রাম। জাতি-

উপজাতির সম্প্রীতি গ্রামটির ঐতিহ্য। এই গ্রামে কয়েক যুগের প্রতিবেশী সাধুরাম ত্রিপুরা ও বিনোদ হালদারের বাবা। লেখক দুই পরিবারে সম্প্রীতির ইতিহাস তুলে ধরেছেন গল্পের বয়ানে— "পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে বিনোদের বাবা যখন এখানে ঘর বাঁধে, তখন থেকেই বিনোদ আর সাধুরামের বড় ছেলে পর্বকুমার যেন দু' টি ভাই।"[১১]

কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। লেখকের ভাষায়— "সে সব দিনের কথা এখন ইতিহাস।"[১২] ৮০-এর জুনের ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির সম্প্রীতির বন্ধনে ফাটল ধরায়। এক বিচ্ছিন্নতাবাদী কায়েমি গোষ্ঠীর মদতদানে ত্রিপুরার উগ্রবাদ সমস্যা ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। তারই প্রভাব পড়েছে গল্পে। সম্প্রীতির 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা' গল্পটির মূল সুর এবং ত্রিপুরার সনাতনী ঐতিহ্য লেখক কাহিনি চরিত্রাঙ্কনের আন্তরিকতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল অশুভ ভাবনা থেকে মানবিক চেতনার উত্তরণ। এই আশাবাদ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই গল্পকার হরিভূষণ পালের সাহিত্য প্রতিভার অসাধারনত্ব প্রমাণিত হয়।

'অচিন বৃক্ষ' হরিভূষণ পালের অপেক্ষাকৃত আয়তনে একটি বড়ো গল্প। বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনির অন্তর্বয়নে লেখক কাকনবাড়ি গ্রামের পটভূমিকায় গত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে নয়ের দশক পর্যন্ত সময়পর্বে একটি মিশ্র জনপদের বিবর্তনকে সুদক্ষ শিল্পীর মত এঁকেছেন। কাকনবাড়ি গ্রামের বিশাল অচিন বৃক্ষকে কেন্দ্র করে গল্পের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি, জীবনকৃত্য, জীবনযাত্রা প্রণালী এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নকশাল আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, ভোটকেন্দ্রিক উত্তাল পরিবেশ প্রভৃতি সুকৌশল বর্ণনায় লেখক বৈচিত্র্যময় কাহিনি উপস্থাপন করেছেন। গল্পে একটি গাছকে কেন্দ্র করে লেখক গ্রামীণ জীবনচিত্র যেমন উদ্ভাসিত করেছেন, তেমনি দরবেশ আলী চরিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে ষাট থেকে নব্বই দশকের বৃহৎ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিচয়দানে মুন্সিয়ানার স্বাক্ষর রেখেছেন।

গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে একদল বিচ্ছিন্নতাবাদী বিপথগামী মানুষ ত্রিপুরার বাঙালি জাতি-উপজাতির দীর্ঘদিনের মৈত্রী-প্রীতি ধ্বংস করে হত্যালীলায় অবতীর্ণ হয়। পরবর্তী দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে সেই ভয়াল সময়। স্বার্থান্বেষী অমানবিক এই বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রপন্থির দল নিজেদের স্বার্থ সাধনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ কিছুই মানে না, নির্দ্বিধায় তারা মানুষ নিধন কার্য চালিয়ে যায়। সেই উত্তাল সময়ে কেবলমাত্র সন্দেহ আর অবিশ্বাসের দরুন সহজ-সরল পাহাড়ি জনজাতিদের উপর রাজ্য প্রশাসনের প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক হস্তক্ষেপ তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলে। সেই প্রেক্ষাপটেই রচিত হরিভূষণ পালের একটি অসাধারণ গল্প 'তপ্ত টিনের চালে বিপন্ন বিড়াল'।

ভারতের সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে সমাজ থেকে জাতিগত, বর্ণগত ভেদাভেদের বিষয়টি তুলে দিয়ে তথাকথিত নিম্ন শ্রেণির মানুষদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করলেও বর্তমান যুগেও মানুষের অবচেতন মনের কোথাও না কোথাও সাম্প্রদায়িকতার বীজ লালিত হয়ে চলেছে। লেখক হরিভূষণ পাল সমাজের এই ভেদাভেদ ভাবনার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর রচিত একটি অসাধারণ গল্প 'অন্যদাহ'।

হরিভূষণ পালের 'ভূমিপুত্রের চশমা' গল্পে ত্রিপুরার একটি পার্বত্য এলাকাকে কেন্দ্র করে সেখানকার উপজাতি জনগোষ্ঠীর জীবনচর্যা ও সংস্কৃতির চিত্র লেখক বাস্তবিক পটে চিত্রাঙ্কন করেছেন। গল্পের নামকরণটিও তাৎপর্য মণ্ডিত এবং গল্পের নামকরণের মধ্য দিয়েই লেখক ত্রিপুরার বিশেষ একটি সময়ের পালাবদল দেখিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র হর্ষ এতদিন রঙিন চশমার আড়ালে অর্থাৎ শহরের চাকচিক্যতার মধ্যে নিজের জাতিগত বাস্তবিক চিত্র কিছুই জানতে পারেনি। এবার সে খোলা চোখেই আদিবাসী জীবনের বাস্তব রূপটি

প্রত্যক্ষ করেছে। লেখক রঙিন চশমার প্রতীকে শহর ও পাহাড়ের আদিবাসী জীবনের পার্থক্য সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর দৃষ্টিতে অসাধারণরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এইভাবেই কথাকার হরিভূষণ পাল উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দেশ-কালের প্রেক্ষিত, সমসাময়িক ঘটনা এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোটগল্পের দর্পণে একটা গোটা দুই দশক সময়কালের দলিল নির্মাণ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. পাল, হরিভূষণ। আগামীকাল চব্বিশ ঘণ্টা ত্রিপুরা বন্ধ। সৈকত প্রকাশন, ২০০৩, আগরতলা, পৃ. ৪৪।
২. তদেব, পৃ. ৪৬।
৩. সোম, শোভন। অতুলপ্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি প্রকাশন, ২০০২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রিট, কলকাতা, পৃ. ৬৩।
৪. পাল, হরিভূষণ। জলছবির আয়না। সৈকত প্রকাশন, ২০০৫, আগরতলা, পৃ. ৭।
৫. তদেব, পৃ. ৭।
৬. তদেব, পৃ. ১০।
৭. তদেব, পৃ. ১৪।
৮. তদেব, পৃ. ১৫।
৯. তদেব, পৃ. ১৯।
১০. তদেব, পৃ. ১৯।
১১. পাল, হরিভূষণ। আগামীকাল চব্বিশ ঘণ্টা ত্রিপুরা বন্ধ। সৈকত প্রকাশন, ২০০৩, আগরতলা, পৃ. ৮৬।
১২. তদেব, পৃ. ৮৭।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. পাল, হরিভূষণ। আগামীকাল চব্বিশ ঘণ্টা ত্রিপুরা বন্ধ। সৈকত প্রকাশন, ২০০৩, আগরতলা।
২. পাল, হরিভূষণ। জলছবির আয়না। সৈকত প্রকাশন, ২০০৫, আগরতলা।
৩. সোম, শোভন। অতুলপ্রসাদ সেনের শ্রেষ্ঠ কবিতা। ভারবি প্রকাশন, ২০০২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রিট, কলকাতা।